بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৭ আগস্ট ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৭ আগস্ট ২০১২-এর (১৭ যহুর, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (সূরা আল্ আহযাব:২২)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (সূরা আলে ইমরান:৩২)

প্রথম আয়াতটি সুরা আহযাবের আর এর অনুবাদ হল, নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্ ও পরকালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অনেক বেশি স্মরণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতটি সুরা আলে ইমরানের আর এর অনুবাদ হল, তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। (এমনটি হলে) আল্লাহ্‌ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আশিস, কৃপা এবং পুরষ্কারের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাদেরকে তাঁর 'আবদ' অর্থাৎ বান্দা হবার কথা বলেছেন। অর্থাৎ তোমরা আমার সেই বান্দায় পরিণত হও যারা আমার নির্দেশ পালন করে। গত খুতবাতেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পথে চললেই একজন মানুষ আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাসত্বের গন্ডিভুক্ত হয়। আর এর (গন্ডিভুক্ত হবার) জন্য আল্লাহ্ তা'লা অসংখ্য আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের দায়িত্ব হল, এগুলোর উপর অনুশীলনের চেষ্টা করা। এরূপ করা এ জন্য আবশ্যক যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي অর্থাৎ 'তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে একজন মু'মিন যেন আল্লাহ্ তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত দাস হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারে। দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য অবলোকনকারী হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার যেসব আদেশ-নিষেধ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা আমরা পাঠ করি এবং শ্রবণ করে থাকি। কিন্তু পড়ার ও শোনার চেয়ে বাস্তব দৃষ্টান্তে অধিক প্রভাবিত হবার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা মানব

প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন। (বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখে) মানুষের মধ্যে এক প্রকার উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কারো সাথে ভালবাসার দাবী থাকলে মানুষ প্রেমাস্পদের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি ও কর্মকে রপ্ত করার চেষ্টা করে। এর ফলে তার কর্মের ধারা পাল্টে যায়। কিন্তু ভালবাসার দাবীর সাথে এবং এই ভালবাসার কারণে প্রেমাস্পদকে যখন আদর্শ বানানো ঈমান বলে বিবেচিত হয় তখন একজন মু'মিনের এ ছাড়া আর কোন আকাঙ্খা থাকে না আর থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়, অর্থাৎ সে প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি নিজের ঈমানকে সঠিক রাখবে এবং তাতে উন্নতি করতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর উম্মত বানিয়েছেন এবং তাঁর সব আদেশ-নিষেধ মহানবী (সা.)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন রূপে অবতীর্ণ করে তাঁকে আমাদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিয়েছেন, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য। তিনি (সা.) এমন এক পরিপূর্ণ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন যা তাঁকে (সা.) একজন পরিপূর্ণ 'আবদ' অর্থাৎ দাস বানিয়ে দিয়েছিল। আমি যে আয়াত দু'টি পাঠ করেছি তাতে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বরং এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, একজনের ঈমান এনে মুসলমান হিসেবে দাবী করা তখনই পূর্ণতা লাভ করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারবে যখন সে আমার রসূলের আদর্শের পূর্ণ অনুকরণ করে সেই পথে চলবে। এ ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ। এ আদর্শে পরিচালিত হওয়া ব্যাতিরেকে পরকালীন আশিস লাভের আশা করা বৃথা।

এ আদর্শের অনুসরণ না করলে কোন পুণ্যকর্মই প্রকৃতপক্ষে পুণ্যকর্ম হিসাবে গণ্য হতে পারে না; এ আদর্শের অনুসরণ না করলে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত সম্পূর্ণ হয় না; এ আদর্শের অনুসরণ না করলে আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর যিক্র সেই মর্যাদা দিতে পারে না যা আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করে এবং এ আদর্শের অনুসরণ না করলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। এ আদর্শের অনুসরণ না করে তোমরা আল্লাহ্র রহিমীয়্যত (কৃপা) থেকে সেই অংশ পেতে পার না যে উদ্দেশ্যে তোমরা তাঁকে ডাকছ। এ আদর্শের অনুসরণ না করে কেউ আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করতে পারে না যদ্বারা সে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হবে। আর তাঁর অনুসরণ না করলে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসাও পাওয়া যাবে না।

অতএব যেভাবে আমি বলেছি, এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা মুসলমান। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা না করে এবং তাঁর প্রদর্শিত পন্থায় আমাদের উপর আরোপিত বিধি-বিধানের উপর চলার চেষ্টা না করে আমরা তাঁর উম্মত ও মুসলমানের গন্ডিভূক্ত হবার কল্যাণ লাভ করতে পারি না। **'আল্ ইমামু জুন্নাতুন'** অর্থাৎ ইমাম ঢালস্বরূপ-একথা বলে তিনি আমাদের সেই আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে, নিজ প্রচেষ্টার বলে নয় বরং আমার আর্দশের অনুসরণ করেই তোমরা শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রকৃত আব্দ বা বান্দা হতে পার। আমার ঢালের পেছনে থাকলে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে। ইবাদতের প্রয়োজন আছে কিন্তু এ কথা মনে করো না যে, আমি যা করি নি এমন কাজ করে তোমরা পূর্ণাঙ্গীণ ইবাদত করতে পারবে, আর না-ই আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করতে পারবে। না এটি কখনোই সম্ভব নয়। এ যুগে আমাদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশেষ অনুগ্রহটি হল, তিনি আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত আদর্শকে জানতে, বুঝতে ও এর উপর আমল করতে শিখিয়েছেন। ইবাদতের নামে যেসব নতুন নতুন 'যিক্র আয্কার' বা আসর বসানোর যে বিদআত প্রচলিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এগুলো মহানবী (সা.)-এর আদর্শ থেকে প্রমাণিত

নয়। তাই এগুলো আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রদান করতে পারে না। অতএব আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য হুযূর (সা.)-এর আদর্শ মোতাবেক আমল করা আবশ্যক।

আমি এখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শের কতক উদাহরণ তুলে ধরব। তাঁর কর্মজীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। তবে এর আগে আমি মহানবী (সা.)-এর ইবাদত ও অন্য কিছু উপমা উপস্থাপন করব যা আমাদের জন্য পথনির্দেশক, যেগুলো পালন করলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হতে পারি এবং তাঁর ভালবাসা পেতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত রসূলে আকরাম (সা.) সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে হুযূর (সা.)-এর যে মর্যাদা ছিল এবং যা কিছু তিনি উপস্থাপন করেছেন সেগুলো আমি আগে বর্ণনা করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ' قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا **(সূরা আয্ যুমার: ৫৪) অর্থাৎ 'তুমি বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করছ। তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন।'- এ আয়াতে "কুল ইয়া ইবাদিল্লাহ্! যার অর্থ তুমি বল, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা!"- একথা না বলে বলা হয়েছে, 'কুল ইয়া ইবাদী অর্থাৎ তুমি বল, হে আমার বান্দারা!' এ পদ্ধতি অবলম্বনের রহস্যটি হল, এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লা যেন অসীম দয়ার সুসংবাদ দেন এবং যারা পাপের আধিক্যে হতবিহ্বল তাদেরকে যেন সান্ত্বনা প্রদান করেন। কাজেই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ চেয়েছেন তিনি যেন তাঁর রহমতের দৃষ্টান্ত দিয়ে বান্দাদের দেখিয়ে দেন, আমি আমার বিশ্বস্ত বান্দাদের কতটা বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করি।'** অর্থাৎ পাপের ফলে যারা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে তাদের তুমি বলে দাও, আল্লাহ্ তা'লার রহমত কতটা বিস্তৃত এবং তিনি কীভাবে পুরস্কৃত করেন। হুযূর (আ.) বলেন, **'অতএব তিনি قُلْ يَا عِبَادِيَ -শব্দের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন, দেখ! আমার প্রিয় রসূল, আমার এ পুণ্যবান বান্দা পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফলে এমন স্তরে উপনীত হয়েছেন যে, আমার সবই এখন তাঁর। যে ব্যক্তি মুক্তি কামনা করে সে যেন তাঁর দাস হয়ে যায়।'** অর্থাৎ সে তাঁর আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হবে যেন তাঁর দাস। এমন হলে সে যতো বড় পাপীই হোক না কেন তাকে ক্ষমা করা হবে। তিনি (আ.) বলেন, **'মনে রাখতে হবে- আরবী অভিধান অনুযায়ী আব্‌দ শব্দটি দাস অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেভাবে মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেন, وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ** (অর্থাৎ একজন মু'মিন দাসও মুশরেক অপেক্ষা উত্তম- সূরা আল্ বাকারা, ২২২)- **এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যে ব্যক্তি মুক্তি কামনা করে সে যেন এই নবীর সাথে দাসত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলে অর্থাৎ সে যেন তাঁর নির্দেশের বাহিরে না যায় এবং তাঁর আনুগত্যে সেভাবে নিয়োজিত থাকে যেভাবে একজন দাস থাকে– তবেই সে মুক্তি পাবে।'** অর্থাৎ একজন ভৃত্য যেভাবে তার মনিবের আনুগত্য করে সেভাবে এই রসূলের আনুগত্য কর। হুযূর (আ.) বলেন, **'এখানে বিদ্বেষী ও নামসর্বস্ব একত্ববাদী লোকদের জন্য পরিতাপ!** (কেউ কেউ বলে, এমন কিছু নাম আছে যা রাখা উচিত নয়) **যারা আমাদের নবী (সা.)-এর প্রতি এতোটা বিদ্বেষ পোষণ করে যে, তাদের মতে এসব নাম, যেমন গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম মুস্তফা, গোলাম আহমদ, গোলাম মুহাম্মদ শির্‌কতুল্য।'** তিনি (আ.) বলেন, **'আর এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, এ নামই হল মুক্তির দিশারী।'** অর্থাৎ আন্তরিকতার সাথে ও বাস্তবিক অর্থে এ নামগুলোকে দৃষ্টিতে রেখে যদি নিজেদের আমল ঠিক করে এবং নিজেদের নামকে সেসব বৈশিষ্ট্যে

সজ্জিত করে তবে এর মাধ্যমে মুক্তিও লাভ হয়, নাম রাখলেই মুক্তি পাওয়া যাবে এমনটি নয়, অর্থাৎ এমন নাম রেখে যতো খুশি মন্দ কাজ করার পরও মানুষ মুক্তি পেয়ে যাবে এমন ভাবা ঠিক নয় বরং এ বাক্যটির প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত যাতে তিনি (আ.) বলেছেন, 'আদেশ অমান্য করবে না'; যেসব বিধি-বিধান আছে তা অমান্য করবে না- এ বাক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, **'আব্‌দ শব্দের অর্থে যেহেতু এ বিষয়টিও অন্তর্হিত রয়েছে যে, কোন প্রকার স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না।'** অর্থাৎ দাসত্ব তখন হয় যখন নিজের কোন স্বাধীনতা থাকে না এবং নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষ যা খুশি করতে পারে না। **'নিজ প্রভুর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। কাজেই সত্যান্বেষীদের মাঝে এ তৃষ্ণা রেখে দেয়া হয়েছে যে, যদি মুক্তি চাও তবে নিজের মাঝে এ বোধ জাগ্রত কর। আসলে এ আয়াত এবং قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ -এ আয়াতের অর্থ একই।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এ আয়াত ও পূর্বে যে আয়াতটি পাঠ করা হয়েছে, এ দু'টি আয়াতের অর্থ একই। **'কেননা এমন বিলীনতা ও আনুগত্যের জন্য পূর্ণাঙ্গীণ অনুসরণ আবশ্যক।'** অর্থাৎ পূর্ণ আনুগত্যের জন্য কারো সর্বাধিক অনুসরণ করা আবশ্যক, আনুগত্য করলেই অনুসরণ ও অনুগমন হবে। তিনি (আ.) বলেন, **'আব্‌দ শব্দে যার অর্থ পাওয়া যায়। পুরো বাক্যটি হল, কেননা এমন বিলীনতা ও আনুগত্যের জন্য পূর্ণাঙ্গীণ অনুসরণ আবশ্যক যা আব্‌দ শব্দের অর্থে নিহিত রয়েছে। এটিই হল রহস্য, যেভাবে পূর্বের আয়াতে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি বরং খোদার প্রিয়পাত্র হবার সুসংবাদ রয়েছে। আর 'কুল ইয়া ইবাদী'-এ আয়াতটিকে এভাবে বলা যায় 'কুল ইয়া মুত্তাবিয়ী' অর্থাৎ হে আমার অনুসারী! যারা অনেক পাপ করেছ তোমরা আল্লাহ্ তা'লার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ আমার অনুসরণের কল্যাণে সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। 'আব্‌দ' দ্বারা যদি শুধু আল্লাহ্‌র বান্দা বুঝানো হয় তবে অর্থ সঠিক হবে না। কেননা কিছুতেই এটি সঠিক নয় যে, ঈমান ও অনুসরণের শর্তে আল্লাহ্ তা'লা কোন রকম যাচাই বাছাই ছাড়াই সমস্ত মুশরিক ও কাফিরকে এমনিতেই ক্ষমা করে দিবেন।'** অর্থাৎ ঈমান যদি পূর্ণ না হয় এবং অনুসরণ ও অনুগমন যদি পূর্ণাঙ্গীণ না হয় তবে ক্ষমা করা যায় না। নয়তো মুশরিক ও কাফিরদেরকেও এমনিতেই আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দিতেন। তিনি (আ.) বলেন, **'এমন অর্থ কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের একদম পরিপন্থী।'**

অতএব এ সুসংবাদ এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করে। কেননা তাঁর আনুগত্যের ফলে গুরুতর পাপও মোচন হয়ে যায়। যেভাবে আমি বলেছি, এ আদর্শের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব। এ রমযানে এবং প্রতি বছর যে রমযান আসে তাতে আল্লাহ্ তা'লা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন যার ফলে পুণ্যকর্ম ও ইবাদত করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর এবারও হয়েছে। তাই সত্যিকার অর্থে কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার বান্দা ও প্রিয়ভাজন হতে চায় তবে মহানবী (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণ করতে থাকা আবশ্যক। এমন নয় যে, একবার আমল করলাম আর দরকার নেই। মহানবী (সা.)-এর আমল বা আদর্শ কোন একটি বিষয়ের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল না এবং শুধু রমযানের জন্যও নির্দিষ্ট ছিল না। বরং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা, 'কানা খুলুকুহুল কুরআন'-আর একথা তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল মূর্তিমান মহান কুরআন। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'পাপের ফলে নিরাশ ব্যক্তিরাও আশার আলো দেখতে পায়। এটি তখনই হয় যখন এ মহান আদর্শের উপর পরিচালিত হবার দৃঢ়**

সংকল্প থাকে। শুধু সংকল্পই যথেষ্ট নয় বরং তদ্বনুসারে কর্মও করতে হয় এবং এর ধারাবাহিকতাও বজায় রাখতে হবে।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, **'এখানে এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, এ আয়াতের অর্ন্তনিহিত বিষয় হল** (এ আয়াতের সারমর্ম বা মূল বিষয় অথবা উদ্দেশ্য হল) **হে আল্লাহ্‌র রসূল! যারা মনে-প্রাণে তোমার দাস হয়ে যাবে তাদেরকে ঈমানের সেই নূর, ভালবাসা ও অনুরাগ প্রদান করা হবে যা তাদেরকে গায়রুল্লাহ্ থেকে মুক্তি দিবে এবং তারা পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর ইহজগতেই তাদেরকে এক পবিত্র জীবন দান করা হবে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবর থেকে তাদের মুক্তি দেয়া হবে।'**

এ রমযানের একটি উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যাচনা করা, তাঁর হয়ে যাওয়া এবং তাঁর ইবাদত করা; আর এরই নাম গায়রুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো আকর্ষণ) থেকে মুক্তি। তাই এটি পূর্ণ করার জন্য মহানবী (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণ একান্ত আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেছেন, **'এ জগতেই তাদেরকে এক পবিত্র জীবন দান করা হবে এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবর তাদের মুক্ত করা হবে। যে অনুসরণ করবে তার প্রতি-ই এ হাদীস ইঙ্গিত করছে, أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي অর্থাৎ আমি সেই মৃতদের উত্থানকারী যার পদাঙ্গ অনুসরণে মানুষের পুনরুত্থান ঘটবে।'** (পায়ে উঠানোর অর্থ হল, আমার অনুসারী, আমার পদাঙ্ক অনুসরণকারী) তিনি (আ.) বলেন, **'এটি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, পবিত্র কুরআন এমন বাগধারায় পরিপূর্ণ-"জগৎ মরে গিয়েছিল আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই খাতামান্নাবীঈন (সা.)-কে প্রেরণ করে এ পৃথিবীকে নবজীবন দান করেছেন'**। যেভাবে তিনি বলেছেন, اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا। অর্থাৎ শুনে নাও! পৃথিবীর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা একে জীবিত করেন (সূরা আল্ হাদীদ: ১৮)। একইভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন, وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ অর্থাৎ পবিত্রাত্মা দ্বারা তাঁদের সাহায্য করা হয়েছে (সূরা আল্ মুজাদেলা: ২৩)। আর পবিত্র আত্মার সাহায্য করার অর্থ হল, হৃদয়গুলোকে জীবিত করে, আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকে মুক্তি দেয় এবং পবিত্র শক্তি, অনুভূতি ও পবিত্র জ্ঞান দান করে। আর নিশ্চিত জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের মার্গে পৌঁছে দেয়। আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকে মুক্তি কী? এটি পার্থিব কামনা বাসনাকে বিসর্জন দেয়ার অপর নাম। এটি নিজের প্রবৃত্তিকে পদদলিত করার নাম, যে বিষয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি আল্লাহ্ তালার সন্তুষ্টিকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়ার নাম। অতএব সাহাবা (রা.) এ সব কিছু করেছেন বলেই আল্লাহ তা'লা তাঁদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক জীবন দান করেছেন। তাঁদেরকে পবিত্র বৈশিষ্টাবলী দান করেছেন যার মাধ্যমে তাঁরা শয়তানের মোকাবেলা করেছেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে পবিত্র করেছেন, তাঁদেরকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন যা তাদের বিশ্বাস ও ঈমানকে পরম মার্গে উপনীত করেছে। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রতি তাদের আইনুল ইয়াক্বীন (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা স্বয়ং আল্লাহ তা'লার ক্ষমতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে যা তাঁদেরকে আল্লাহ তা'লা নৈকট্য দান করেছে। এ সবকিছু তাঁরা তাঁদের মনিব ও অনুকরণীয় নেতা (সা.)-এর অনুসরণ করার ফলেই লাভ করেছেন। وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আল্ আনকাবূত:৭০) অর্থাৎ যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করে তাদেরকে অবশ্যই আমরা আমাদের পথের পানে পরিচালিত করি। আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশের মর্ম তাঁরা

অধিক বুঝেছেন এবং আমি যেভাবে বলেছি তাঁরা সব কিছু মহানবী (সা.)-এর আদর্শে চলার চেষ্টার ফলে লাভ করেছেন হয়েছে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আর এই তত্ত্বজ্ঞান যা মুক্তির পথ নিশ্চিতভাবে সেই জীবন ছাড়া অর্জিত হতে পারে না যা রূহুল কুদুসের মাধ্যমে মানুষ লাভ করে। আর পবিত্র কুরআন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাবী করে, সেই আধ্যাত্মিক জীবন শুধু এই রসূল (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণেই লাভ হয়।'**

অর্থাৎ এই যে জ্ঞানের উল্লেখ হল, আধ্যাত্মিক অনুশীলনে মুক্তি লাভ হয়। পবিত্র বৈশিষ্ট্যাবলী দান করা হয়। পবিত্র চেতনা দান করা হয়। পবিত্র জ্ঞান দান করা হয়। তিনি বলেন, এই জ্ঞান যা মুক্তির পথ, এই জ্ঞানই মুক্তির কারণ হয়। কেউ নিজে এমন জীবন অবলম্বন করার চেষ্টা করে এটি অর্জন করতে পারে না বরং মানুষ এটি রূহুল কুদুসের মাধ্যমে লাভ করে আর পবিত্র কুরআনের দৃঢ় দাবী, সেই আধ্যাত্মিক জীবন শুধু রসূল (সা.)-এর অনুসরণে লাভ হয়। মহানবী (সা.)-এর আদর্শে চলে এবং তাঁর অনুসরণে যে জীবন লাভ হয় তা আধ্যাত্মিক জীবন, দৈহিক জীবন নয়। আর সেসব মানুষ যারা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ হতে বিমূখ তারা মৃত— যাদের মাঝে এই আধ্যাত্মিক জীবনের স্পন্দন নেই। এরপর বলেন, আর আধ্যাত্মিক জীবনের অর্থ হল, মানুষের সেই সমস্ত জ্ঞান ও ব্যবহারীক শক্তি যা রূহুল কুদুসের সমর্থনে সঞ্জিবিত হয় আর পবিত্র কুরআন থেকে এটি প্রমাণিত, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যেসব বিধি-বিধানে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তা ছয়শত। তেমনিভাবে এর বিপরীতে জিব্রাঈল (আ.)-এর পাখার সংখ্যাও ছয়শত। আর মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ছয় শত নির্দেশ শিরোধার্য করে জিব্রাঈলের পাখার নিজে আশ্রয় না নিবে তাঁর মাঝে ফানা ফিল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র মাঝে বিলীন হয়ে যাবার বাচ্চা জন্ম হয় না। মানুষের যে খোলস রয়েছে, জন্মের যে ডিম রয়েছে (উপমা দেয়া হয়েছে) তা সেই ছয় শত বিধি-বিধানকে যতক্ষণ নিজের মাঝে আত্মস্থ না করবে ততক্ষণ মানুষ ফানা ফিল্লাহ্ হতে পারে না। সেই বাচ্চা জন্ম হতে পারে না যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। আর মানুষ নিজের ভেতর ছয় শত ডিমের শক্তি রাখে। এটি কোন কঠিন বিষয় নয়। আল্লাহ তা'লা মানবের মাঝে এই শক্তি দিয়েছেন, মানুষ যদি চায় আর চেষ্টা করে তাহলে নিজের মাঝে এসব বিধি-বিধান পালন করার ক্ষমতা ও সামর্থ রাখে। তিনি (আ.) বলেন, **'যে ব্যক্তির শক্তির ছয় শত ডিম জিব্রাঈল (আ.)-এর ছয় শত পাখার অধীনে চলে আসে সেই ব্যক্তি পরিপূর্ণ এবং তার এই জন্ম পরিপূর্ণ জন্ম এবং এই জীবন পরিপূর্ণ জীবন।'** অর্থাৎ এ বিষয়গুলো অর্জিত হলেই সত্যিকার আধ্যাত্মিক জন্ম হয় এবং সত্যিকার আধ্যাত্মিক জীবনও লাভ হয়। অতএব এ ছয়শ নির্দেশকে শিরোধার্য করে নাও। তিনি (আ.) বলেন, **'গভীর পর্যবেক্ষণে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে রূহুল কুদুসের মাধ্যমে মানব ডিম্বের যে আধ্যাত্মিক সন্তান জন্ম হয়েছে তা সংখ্যা, গুণমান, আকৃতি, ধরণ এবং অবস্থার দিক থেকে সকল নবীর সন্তানদের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।'**

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যে এই যে আধ্যাত্মিক সন্তানের জন্ম হয়েছে, মানুষের মাঝে যে আধ্যাত্মিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে তা সংখ্যা, গুণমান, আকার-প্রকৃতি ও নিজের ধরণের দিক থেকে সর্বাবস্থায় অন্যান্য নবীর মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, তা থেকে অনেক উন্নত।

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,** كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (সূরা আলে ইমরান: ১১১) **অর্থাৎ তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানুষের সংশোধনের নিমিত্তে সৃষ্টি করা হয়েছে।'**

যেহেতু ‘খায়রে উম্মত’ (শ্রেষ্ঠ উম্মত) আখ্যা দেয়া হয়েছে, আমরা প্রায়ই বক্তৃতাদিতে ‘খায়রে উম্মত’ শব্দটি বলতে হতে শুনি, বাস্তবিক অর্থে শ্রেষ্ঠ উম্মত হবার জন্য আবশ্যক, নিজের মাঝে যেন সে সমস্ত আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করার চেষ্টা করা হয়, ঐ অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা– যার শিক্ষা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) যা তুলে ধরেছেন, আর পবিত্র কুরআনে যার উল্লেখ রয়েছে। এরপর যখন এভাবে নিজেদের সংশোধন হবে, মানুষ যখন এই মার্গে পৌঁছবে, তখনই সে অন্যের সংশোধনের কাজ করতে পারে। সংশোধনের কাজ তখনই বর্তাবে, আমরা যখন রসূলের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করব এবং নিজেদের জীবন সে অনুযায়ী পরিচালিত করব তখনই এটি সুফল বয়ে আনবে। যখন সর্বদা নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করব, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে পা বাড়াতে থাকব বা সর্বদা এ চেষ্টায় রত থাকব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন তার আলোকে যখন দেখব যে কোথায়, কোন বিষয়ে, কীভাবে এবং কোন সীমা পর্যন্ত আমরা সেটি পালনের চেষ্টা করছি। তখন আমরা নিজেদের মাঝেও বিপ্লব সাধন করব এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাও বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হব। অতএব নিঃসন্দেহে একজন পাপীষ্ঠ ব্যক্তিও আল্লাহ্ তা’লার প্রিয়বান্দা হতে পারে, তার সব পাপ ক্ষমা হতে পারে, কিন্তু তা সম্ভব কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শে পরিচালিত হবার মাধ্যমে আর নিজের সর্বশক্তি দিয়ে এজন্য চেষ্টা করার মাধ্যমে।

আমরা দেখতে পাই, মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক রয়েছে। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলার জন্য আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, কীভাবে এবং কোন সীমা পর্যন্ত মানুষ এটি অর্জন করতে পারে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। এ আদর্শের উপর পরিচালিত হবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লার ভালবাসা লাভ হয় যার ফলে বান্দা তাঁর প্রিয় খোদার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে। সর্বপ্রথম আমরা দেখি, খোদা তা’লার প্রতি ভালবাসা, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁর ইবাদতের কী অনুপম দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই মহান নবী যিনি সারা দিন রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী ও নিজ অনুসারীদের সংশোধন, তরবীয়ত এবং তাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখাতে ব্যস্ত থাকতেন, সাধারণ দিনগুলোতেও তাঁর অনেক ব্যস্ততা থাকত, যুদ্ধক্ষেত্র এবং আশংকাজনক পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন ব্যস্ততার পাশাপাশি দৈহিক পরিশ্রমও চরম রূপ ধারণ করত। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও আমরা তাঁর দিনের ইবাদতে কোন বিঘ্ন হতে দেখি না, রাতের ইবাদতেও না। ইবাদতের জন্য তিনি যখন রাতে দন্ডায়মান হতেন তখন তাঁর পা ফুলে যেত আর এটি আল্লাহ্ তা’লার ‘রাতে ইবাদত করার’ নির্দেশ অনুসারে করতেন। তাঁর রাতের ইবাদত অর্ধেক রাত আবার কখনো তার চেয়েও বেশী ছিল। আল্লাহ তা’লা বলেন, إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (সূরা আল্ মুযযাম্মেল:৭)। অর্থাৎ (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাতে উঠা নিশ্চয় প্রবৃত্তিকে পদদলিত করার জন্য মোক্ষম এবং কথায় (প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে) অধিক শক্তিশালী।

একবার হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তো এমনিতেই খোদা তা’লার নৈকট্যপ্রাপ্ত। আপনি আপনার আত্মাকে এত কষ্টে কেন নিপতিত করেন? তিনি (সা.) বললেন, হে আয়েশা! ‘আফালা আকূনা আব্দান শাকূরা’। আমি যদি আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে থাকি এবং আল্লাহ্ তা’লা যে এত আশিস আমার প্রতি করেছেন তাহলে আমার কি দায়িত্ব বর্তায় না, আমি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হই?** কৃতজ্ঞতা অনুগ্রহের বিনিময়ে হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি (সা.) সর্বদাই আল্লাহ্ তা’লার আশিস এবং অনুগ্রহরাজিকে

স্মরণ করতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। আমাদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে শুধু মুসলমানই বানান নি বরং মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাসকে তাঁর সালাম পৌঁছানোর তৌফীকও দিয়েছেন। এটি এত বড় অনুগ্রহ, এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যায় না। সত্যিকার অর্থে একজন আহমদী এর পুরোপুরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন আমরা এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি না।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এ চেষ্টাই থাকা উচিত, আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত সঠিকভাবে করার চেষ্টা করব। রমযানে নফল পড়ার যে অভ্যাস গড়েছি এটি যেন অস্থায়ী অভ্যাস না হয় এবং আমাদের পার্থিব স্বার্থার্জনের জন্য যেন না হয় বরং এর অধিকাংশে খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ থাকা উচিত। আর এরপর এই ইবাদতের প্রভাব যেন আমাদের কথা ও কাজে পরিস্ফুট হয়।যেভাবে আমি বলেছি, 'খায়রে উম্মত' হয়ে যখন আমরা বিশ্ববাসীর সংশোধনের জন্য চেষ্টা করব, আমাদের কথায় তখনই প্রভাব সৃষ্টি হবে যখন আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা তদ্রুপ হবে। এই ছিল নফলের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ, তিনি কীভাবে রাত জেগে ইবাদত করতেন। ফরজ নামায সঠিকভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কতটা যত্নবান ছিলেন দেখুন! ভীষণ অসুস্থতার মাঝেও যেক্ষেত্রে বসে, শুয়ে এবং ঘরে বসে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে– তিনি এমন অসুস্থতায়ও কারো সাহায্য নিয়ে মসজিদে বাজামাত নামায আদায়ের জন্য যেতেন। তিনি ইবাদতের ব্যাপারে এত কঠোর এবং ইবাদতকে এতটা গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও ইবাদতের ব্যাপারে লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি (সা.) তাঁর ঘরে একবার রশি টানানো দেখে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন জানা গেল হযরত যয়নব (রা.) ইবাদত করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে যেতেন তখন তিনি এই রশির টানে আবার দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি (সা.) এটি অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, যতক্ষণ আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ইবাদত করতে পার কর যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন বসে যাও। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে শক্তি দিয়েছিলেন, তিনি পা ফুলে গেলেও দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারতেন কিন্তু অন্যদের জন্য তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করে দিয়েছেন। কিন্তু এই স্বাচ্ছন্দ্যের অর্থ এই নয়, অনেকের অযথা বসে নামায পড়ার অভ্যাস হয়ে যায়। অনেকের অভ্যাস, সকালে ফজরের নামাযের সময় ওযু না করে বিছানাতেই তৈয়ম্মুম করে এবং বসে বসে নামায পড়ে নেয়। এটিও ভুল। কোন সুযোগ থেকে অন্যায় সুবিধা ভোগ করা উচিত নয় কেননা তখন এটি আর ইবাদত বলে গণ্য হবে না। নিজের শক্তি সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকের নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, তবেই কেউ বলতে পারে আমি উত্তম আদর্শে পরিচালিত হবার চেষ্টা করছি। তিনি (সা.) আমাদের সামনে ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে অনুপম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আমরা দেখেছি। আর আমি এখনই তা বর্ণনা করলাম।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার মহানবী (সা.) যখন বললেন, **কোন ব্যক্তি তার নিজ কর্মবলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনিও কি আপনার কর্মদ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না? আপনি রাতভর ইবাদত করেন, এমন নিমগ্নতার অবস্থা সৃষ্টি হয়,**

আপনার পা ফুলে যায়। মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ আমিও আমার কর্মের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ খোদা তা'লার অনুগ্রহ এবং তাঁর কৃপা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

দেখুন! এটি কেমন ভয়ঙ্কর অবস্থা। ঐসব লোক যারা সামান্য পুণ্য করেই গর্ব করে তাদের জন্য এ বিষয়টি কতই না ভয়ঙ্কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের চাদরে আবৃত রাখুন এবং আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে তাঁর ইবাদত করার তৌফিক দান করুন আর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করারও সৌভাগ্য দিন।

তিনি (সা.) বলেন, **নিজেদের কর্মে পুণ্য অবলম্বন কর এবং খোদা তা'লার নৈকট্যের পথ অন্বেষণ কর।** তিনি (সা.) আরো বলেন, **কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্খা না করে। কেননা সে পুণ্যবান হয়ে থাকলে পুণ্যে ক্রমন্নোতি করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার আশিস সমূহের উত্তরাধিকারী হবে। আর সে মন্দ হলে তওবা বা অনুশোচনার সুযোগ পাবে।** তওবা করার এই সুযোগও খোদা তা'লার অনুগ্রহের ফলেই লাভ হয়। আর এ জন্যও আমাদের দোয়া করা উচিত। কেননা জগতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মন্দকর্মে লিপ্ত এবং ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে এগুচ্ছে। এটি তিনি (সা.) মু'মিনদের উদ্দেশ্যে সাধারণ মন্দের ব্যাপারে বলেছেন। আর এরপর নিজের দুর্বলতা দূর করার সুযোগ হবে। অতএব রমযানেও মানুষ তাদের দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করে থাকে, মন্দকর্ম দূর করার চেষ্টা করে থাকে। কাজেই এজন্য এই চেষ্টা-সাধনাকে আরো বাড়ানো উচিত এবং একে অব্যাহত রাখা উচিত।

তাঁর (সা.) এই নির্দেশ সেসব লোকের জন্য যারা তওবার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তওবা করে পুণ্যে ক্রমন্নোতি করার চেষ্টা করে। আর তারা এ দোয়া করে, **মৃত্যু সবার জন্যই অবধারিত কিন্তু হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় যেন মৃত্যু আসে।**

তিনি (সা.) বলেন, নিজের যোগ্যতা এবং আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার সমূহের সঠিক ব্যবহার না করাও অন্যায়। আর ঐ যোগ্যতাসমূহের সঠিক ব্যবহার এখন ইবাদতেই নিহিত বা বলা যায় এসব যোগ্যতার সঠিক ব্যবহারও ইবাদত। আল্লাহ্ তা'লা যেসব ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েছেন- যেমন কান, চোখ, মুখ, হাত-পা ইত্যাদি দ্বারা উত্তম কাজ করাও ইবাদত বলে গণ্য হয়। কান দিয়ে উত্তম কথা শুনলে তা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানায়। কিন্তু পরনিন্দা ও পরচর্চা শোনা পাপ। কিন্তু কেউ যদি তার কান এজন্য বন্ধ করে রাখে এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ করে রাখে যে, মন্দ কথা শুনবো না তাহলে এটিও তার সঠিক ব্যবহার বলে বিবেচিত হবে না। বরং এটিও এক ধরনের অন্যায়। এভাবে চোখ, মুখ, হাত এবং বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও একই অবস্থা। বর্তমানে আমরা রমযান অতিবাহিত করছি। আর এতে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হল, সেহরী খাও এবং ইফতার কর। তিনি (সা.) তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমাদেরকে এটি করে দেখিয়েছেন। যদি কেউ আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ পালন না করে তাহলে এটিও অন্যায় এবং পাপ হবে। তবে অপারগতার বিষয় ভিন্ন কেননা; কিছু কিছু অপারগতা রয়েছে যেমন, কখনো কখনো মানুষ সময়মত ইফতার পায় না এবং সেহরী খাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। আর যদি কেউ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখে তাহলে এটিও অবাধ্যতা। মোটকথা যে কোন অবস্থাতে খোদা তা'লার নির্দেশে তাঁর নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করাও পুণ্য আর অপব্যবহার করা গুনাহ্ বা অসময়ে ব্যবহার করা গুনাহ্। আর এটিই তিনি (সা.) আমাদেরকে নিজ কর্মদ্বারা করে দেখিয়ে গেছেন।

তিনি (সা.)-এর ধৈর্যশক্তিও ছিল পরম মার্গের। মদ হারাম হওয়ার পূর্বে একজন সাহাবী নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তাঁকে (সা.) অনেক কিছু বলে ফেলেন কিন্তু তিনি তাঁকে কিছু না বলে নিরবে শ্রবণ করতে থাকেন। যখন তিনি মদিনায় আসেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেন আর রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখনও তাঁর মাঝে ধৈর্যের উত্তম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই কেউ যদি কিছু অর্থের মালিক হয় বা কোন ক্ষমতার অধিকারী হয়, সে নিজেকে খুব বড় ভাবতে শুরু করে। তার ইচ্ছা বিরোধী কিছু হলে হৈ-চৈ শুরু করে। পক্ষান্তরে তাঁর (সা.) আচরণ কীরূপ ছিল? একদা এক ইহুদী এসে তাঁর (সা.) সাথে তর্ক শুরু করে। তর্কের মাঝে বার বার 'হে মুহাম্মদ' বলে সম্বোধন করতে থাকে। সে কেবল 'হে মুহাম্মদ' শব্দ উচ্চারণ করছিল। অথচ এটি সে সময়ের ঘটনা যখন তিনি মদিনার শাসক ছিলেন। বরং এর আশে পাশের দুর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর (সা.) শাসন ক্ষমতা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সাহাবীগণ ইহুদীর এভাবে কথা বলা পছন্দ করেন নি। কেননা সাহাবীরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বা রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলে সম্বোধন করতেন। আর অমুসলমানরা তাঁর (সা.) পারিবারিক নাম আবুল কাসেম বলে সম্বোধন করত। তাই ইহুদী বার বার 'হে মুহাম্মদ' বলে সম্বোধন করায় সাহাবীগণ রাগতঃ স্বরে বলেন, যদি রসূলুল্লাহ্ বলতে না পার তাহলে কমপক্ষে তাঁর (সা.) পারিবারিক নাম আবুল কাসেম বলে ডাক। উত্তরে ইহুদী বলে, আমি তাকে তাঁর পিতামাতার দেয়া নামেই ডাকব। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি (সা.) মুচকি হেসে বলেন, সে ঠিকই বলেছে আমার মা-বাবা আমার নাম মুহাম্মদ রেখেছেন, এভাবেই তাকে সম্বোধন করতে দাও, অযথা তোমরা রাগ করো না। অনেক সময় এমনও হত যে, লোকেরা তাঁর (সা.) হাত ধরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকত যে জন্য তাঁর অনেক জরুরী কাজে বাধার সৃষ্টি হত। তাঁর (সা.) সময়ও নষ্ট হত। কিন্তু তিনি (সা.) অত্যন্ত ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করতেন এবং তাদের চাহিদা পূর্ণ করতেন।

ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে অপরাধী ধনী নাকি গরীব, সম্ভ্রান্ত বংশের নাকি নিম্ন বংশের তিনি (সা.) তাতে কোনরূপ পার্থক্য করতেন না। একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা অন্যের সম্পদ চুরি করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে এবং তার জন্য শাস্তি ধার্য হয়। এরফলে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন এবং বিশেষ করে তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে অস্থিরতা দেখা দেয় যে, এই মহিলা তো সম্ভ্রান্ত বংশীয়– তার কেন শাস্তি হবে? উসামাকে মহানবী (সা.) নিকট তার শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি (সা.) একথা শুনে খুবই রাগান্বিত হন। অথচ তিনি সেই মানুষ! যিনি সর্বদা সহানুভূতি ও ক্ষমার আচরণ করেন, উত্তমভাবে বাক্যালাপ করেন আর কখনো রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে রাগান্বিত হয়ে বলেন, **'আমার নিকট খোদার নির্দেশের বিরূদ্ধে সুপারিশ করতে এসেছ। কেবল সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের ছাড় দেয়া ও গরীবদের প্রতি নির্যাতন করার কারণে অতীতে বড় বড় জাতি ধ্বংস হয়েছে। ইসলাম কখনো এর অনুমতি দেয় না। খোদার কসম! আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি এই অপরাধ করত তাহলে আমি অবশ্যই তাকেও শাস্তি দিতাম।'** বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে ন্যায়বিচার নেই বললেই চলে আর এটিই তাদের পতনের মূল কারণ। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের জামাতের কর্মকর্তাদেরও ন্যায়বিচারের দাবী পূর্ণ করা প্রয়োজন এবং এরূপ মান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, কেননা এটি (অন্যায়-অবিচার) অনেক ভয়ানক বিষয় যা পতনের কারণ হয়ে থাকে।

অতঃপর পবিত্র কুরআন শত্রুদের প্রতি ন্যায়বিচারের যে নির্দেশ প্রদান করে এ ব্যাপারে তাঁর (সা.) একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। তিনি (সা.) কোন এক স্থানে সাহাবাকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যখন তারা হেরেমের সীমানায় পৌঁছে, সেখানে তাদের কয়েকজন লোকের সাথে সাক্ষাত হয় যারা তাদেরকে চিনত। সাহাবীদের সন্দেহ হয়, এরা হয়ত মক্কাবাসীদের নিকট তাদের আগমনের সংবাদ পৌঁছে দিবে। তাই তারা তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের মধ্য হতে একজনকে হত্যা করে। যখন সাহাবীরা মদিনায় ফেরত আসেন, পিছনে পিছনে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকেও একজন প্রতিনিধি অভিযোগ নিয়ে আসে যে, হেরেমের সীমায় তারা আমাদের লোককে হত্যা করেছে। তাকে এই উত্তরও দেয়া যেত, তোমরা মুসলমানদের উপর অনেক অত্যাচার করেছ আর হেরেমের সীমারেখার ভেতরও অন্যায় করেছ, সেগুলো কি ভুলে গেছ? কিন্তু তিনি (সা.) বললেন, 'ঠিক আছে, হয়ত তারা এই ভেবে আমার সাহাবীদের মোকাবিলা করে নাই যে হেরেমে আশ্রয় নিয়েছি, তাই এখানে আমাদের জীবন নিরাপদ। আমাদের লোকদের পক্ষ থেকে অন্যায় হয়েছে।' তিনি (সা.) তাকে বললেন, তোমাদেরকে তার রক্তপণ দেওয়া হবে। অতএব আরবের রীতি অনুযায়ী তার রক্তপণ পরিশোধ করা হয়। অতএব এটি সুবিচারের সেই মহান মান যা মহান ন্যায় বিচারক প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। অন্যের আবেগ অনুভূতির প্রতি কীভাবে তিনি সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবার তা দেখুন! এক ইহুদী তাঁর কাছে অভিযোগ করল, হযরত আবু বকর (রা.) আমার মনে আঘাত দিয়েছে আর বলেছে, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, খোদা তা'লা হযরত মুহাম্মদ রসুলূল্লাহ (সা.)-কে হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন। ইহুদী বলল, তাঁর একথা শুনে আমি কষ্ট পেয়েছি। এখন এটি সত্য যে মহানবী (সা.) সব নবীর চেয়েই শ্রেষ্ঠ। আর পবিত্র কুরআনও এ সাক্ষ্য-ই দেয়। কিন্তু তিনি (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, সেই কথা শুরু করেছিল। বলছিল, আমি মূসার কসম খেয়ে বলছি, যাকে খোদা সমগ্র বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তিনি (সা.) বললেন, তারপরও তোমার এটি বলা উচিত হয়নি। অন্যের আবেগকে সম্মান করা উচিত।

অতএব এই ছিল অন্যের আবেগের প্রতি সম্মান। মানব জাতীর সেবককেও তিনি (সা.) কেমন সম্মান করতেন, বর্ণিত হয়েছে, 'ত্বাঈ' গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে আর তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক গ্রেফতার হয়। তাদের মধ্যে আরবের বিখ্যাত দাতা হাতেমের মেয়েও ছিল। তিনি (সা.) যখন তা জানতে পারেন, তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন এবং তার সুপারিশে তার জাতির শাস্তিও ক্ষমা করে দেন। এই ছিল মানবদরদী রসূলের মানবতার সেবকের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং তার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা।

নারীর সম্মান ও মর্যাদা তিনি (সা.) কীভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরবরা নিজেদের রীতি অনুযায়ী নারীদের মারধর করত। তিনি (সা.) এটি জানতে পেরে বললেন, 'নারীগণ খোদার দাসী, তোমাদের দাসী নয়।' এক সাহাবী মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রীদের আমাদের উপর কি অধিকার রয়েছে? তিনি (সা.) বললেন, **'খোদা তোমাদেরকে যে খাবার দান করেন তা থেকে তাকে খাওয়াও এবং পরিধানের জন্য যা দান করেন তা থেকে তাকে পরিধান করাও। তার মুখে আঘাত করো না, তাকে গালী দিও না আর তাকে ঘর থেকে বের করে দিও না।'** এখনো কতক অভিযোগ আসে, এ ধরনের ঘটনা ঘটে। এসব লোকদের চিন্তা করা উচিত। একদিকে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে, অন্য দিকে তাঁর নির্দেশ বহির্ভূত কাজ করে।

মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে নিজ স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে। আর স্ত্রীর সাথে ব্যবহারের দিক থেকে আমি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম।'** যেমন পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশাসনিক ও তরবিয়তী কাজের জন্য তিনি (সা.) খুবই ব্যস্ত থাকতেন। ইবাদতের ব্যস্ততাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরের কাজ-কর্ম এবং দায়িত্বাবলী খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, **'যেটুকু সময় তিনি ঘরে থাকতেন, স্ত্রীদের সাহায্য ও খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন। তার (সা.) অন্য দায়িত্ব ঘরের কাজ-কর্মে বাধা হতো না। কাপড়ে তালি লাগাতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন, ঘরে দেরীতে আসলে স্ত্রীকে না জাগিয়ে স্বয়ং নিজের খাবার বা দুধ পান করে নিতেন।'**

অতএব এ হল সেসব মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ যারা মনে করে ঘরের কাজ-কর্ম করলে জাত যাবে, যদি ঘরে বিলম্বে আসি তাহলেও স্ত্রীর আবশ্যক দায়িত্ব বিছানা থেকে উঠে আমাকে গরম খাবার প্রস্তুত করে দিবে। যদি না করে দেয় তাহলে স্ত্রীর উপর থেকে আমাদের প্রভাব কমে যেতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের মানুষ স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মনে শান্তি পায় না। এমনও কতক মানুষ আছে যাদের সম্পর্কে অভিযোগ আসে, তারা জামাতী কাজকর্মও করে থাকে আর বাইরের লোকদের সাথে খুব ভালো সম্পর্কও বজায় রাখে, কিন্তু ঘরে স্ত্রীর সাথে এমন কঠোর আচরণ করে যা শুনলে মানুষ হতবাক হয়ে যায় যে, এ ব্যক্তি বাইরে কেমন আর ভেতরে কী? এটি দ্বিমুখী আচরণ।

আবার কোন কোন পুরুষকে তার আত্মীয়-স্বজনরাও খারাপ করে থাকে। তাদের মধ্যে এমনকি তার বোন বা মা-ও অন্তর্ভূক্ত। দেখা যায় যদি কোন অতিথির জন্য ঘরের পুরুষ চা বানিয়ে নিয়ে আসে তাহলে তারা বলতে শুরু করে, স্ত্রীর গোলাম হয়ে গেছে বা তার স্ত্রী কেমন প্রকৃতির যে, আমাদের ভাই বা আমাদের ছেলেকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে? বেচারা ভাই বা বেচারা ছেলে ঘরের কাজ করছে আর শেষে এদের এসব কথায় ছেলের মাথা বিগড়ে যায়। এরপর এ প্রকৃতির লোকেরা স্ত্রীর উপর কঠোর আচরণ করতে শুরু করে। যে ব্যক্তি ঘরের এসব খুঁটিনাটি কাজ করে সে তো দুর্ভাগা নয়, বরং এতো মহানবী (সা.)-এর আদর্শ যার উপর আমল করে সে সেই পুণ্য লাভ করছে, নিজের পরিণাম সুন্দর করছে । সে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হবার চেষ্টা করছে। দুর্ভাগা সে তখন হবে যখন স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণের কারণে আল্লাহ্ তা'লার নিকট ধৃত হবে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, ঈমানের অঙ্গীকারের পর তুমি কি এই উন্নত আদর্শ অবলম্বন করেছ? এ তুমি কেমন আদর্শ প্রদর্শন করেছ? একদিকে ঈমানের এ অঙ্গীকার আর অপর দিকে বাহ্যিক ব্যবহার এরূপ?

অতএব এমন পুরুষদেরও নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন। শিশুদের সাথে মহানবী (সা.)-এর ভালবাসা এবং স্নেহের কি দৃষ্টান্ত রয়েছে। বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি (সা.) নিজের সন্তান এবং সাথে থাকা অন্য সন্তানদের জন্য এ দোয়া করতেন **'হে আল্লাহ্! আমি তাদেরকে ভালবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালবাস।'** তিনি (সা.) শিশুদেরকে কখনো শাস্তি দেন নি। সবর্দা প্রেম-ভালবাসা এবং দোয়ার সাথে তরবীয়ত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, **'যখনই মৌসুমের প্রথম কোন ফল আসতো তখন তিনি (সা.) প্রথমে ফলের বরকতের জন্য দোয়া করতেন এরপর মজলিসে অবস্থানকারী সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে প্রথমে এ ফল দেয়া হত।'**

কিছুদিন পূর্বে আমার সাথে এক যুবক স্বাক্ষাত করে, সে আমাকে বলল, আমি সব সময় ভীত থাকি আর আমি ডিপ্রেশনের রোগী হয়ে গেছি। অর্থাৎ সে মানসিক রোগী হয়ে গেছে। ভীতিগ্রস্ত থাকার কারণ হল, আমার পিতা আমাকে সব সময় মারধর করতে থাকেন। যখন তার পিতাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, অকারণে কেন মারধর করেন? তখন সেই পিতা উত্তরে বলে, সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তারের এটি জন্য আবশ্যক। যাহোক কোন কোন পিতা-মাতার অবস্থাও এরূপ। এমনও যালেম পিতা হয়ে থাকে বরং এখানেতো আমরা দেখে থাকি, আজকাল প্রচার মাধ্যমে অনেক বেশি সংবাদ আসছে। ঘটনা এমন, এমনও পিতা-মাতা আছে যারা নিজেদের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের কারণে নিজেদের সন্তানকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। আবার এমন মানুষও আছে যারা নিজের সন্তানকে ভালবাসে ঠিকই কিন্তু অন্যের সন্তানদের সহ্য হয় না, তাদেরকে ভালবাসে না। মহানবী (সা.) এর আদর্শ হল, সকল শিশুর সাথে ভালবাসা এবং স্নেহের আচরণ করা।

পবিত্র কুরআনে প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণের উল্লেখ রয়েছে। তাদের ক্ষেত্রেও তিনি (সা.) উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর বারংবার তিনি তাঁর মান্যকারীদেরকে এই উপদেশই দিয়েছেন। একবার তিনি (সা.) বলেন, **‘খোদার কসম! সে কখনো মু’মিন নয়, সে কখনো মু’মিন নয়, সে কখনো মু’মিন নয়। সাহাবীগণ (রা.) নিবেদন করেন হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কে মু’মিন নয়? তিনি (সা.) বলেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট এবং খারাপ আচরণ থেকে নিরাপদ নয়।’**

অবএব আমি এই গুটিকতক কথার উল্লেখ করেছি। তেমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে অনুপম আচরণ হোক বা পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপার হোক বা অন্যের দোষত্রুটি গোপন রাখার ব্যাপার হোক বা অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো থেকে বাঁচার ব্যাপার হোক বা সুধারণা সম্পর্কিত বিষয় হোক অথবা যে কোন ধরনের উন্নত ব্যবহারের বিষয়ই হোক না কেন, সর্ব ক্ষেতেই তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত এবং তাঁর উপদেশ আমরা পেয়ে থাকি।

অতএব তিনিই ছিলেন পরিপূর্ণ মানব যিনি সব বিষয়ে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সেই যুগের অজ্ঞ লোকদের মাঝে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌প্রেমী মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব আজও যদি আমরা সেই কল্যাণ থেকে লাভবান হতে চাই যা তাঁর এ উম্মতে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত আর আল্লাহ্‌র বান্দা হবার অধিকার প্রদানকারী হতে চাই তাহলে নিজেদেরকে এই আদর্শ মোতাবেক পরিচালিত করতে হবে যেন আল্লাহ্ তা’লার কৃপার উত্তরাধিকারী হয়ে নিজেদের ইহকাল ও পরকালকে অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। এ জন্য আজকে দোয়া করুন, রমযানের অবশিষ্ট দু’তিন দিন রয়ে গেছে। এই দিনগুলোও দোয়া গৃহীত হবার মাসের অন্তর্ভূক্ত, আর সারা জীবন যেন আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে প্রকৃত মু’মিন হিসেব কাটানোর সৌভাগ্য দান করেন। আর আমরা যেন মহানবী (সা.)-এর আদর্শের উপর পরিচালিত হয়ে জীবন যাপনকারী হই।

শেষের দিকে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু কথা উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) বলেন, **‘খোদা তা’লা মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী চলার এবং তাঁর সমস্ত কথা এবং কাজের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেভাবে বলা হয়েছে,** لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ **আবার বলা হয়েছে,**

إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **মহানবী (সা.)-এর কথা এবং কাজে কোন প্রকার ত্রুটি নেই বলেই আমাদের উপর আবশ্যক করেছেন, আমরা যেন তাঁর (সা.) আদর্শের উপর পরিচালিত হই।'**

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পরিপূর্ণভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের মাঝে সৃষ্টি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক গুণাবলী এবং কর্মপদ্ধতি নিজের জন্য পথনির্দেশক না বানাবে। যেভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা এই ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে,** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভের জন্য মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ একান্ত আবশ্যক। তাঁর (সা.) বৈশিষ্ট্য নিজের ভেতর সৃষ্টির মাধ্যমেই প্রকৃত অনুসরণ সম্ভব।'** তিনি (আ.) বলেছেন, **'নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নয় বরং খোদার আশিসেই এই বৈশিষ্ট্য লাভ হয়। সেই আশিস লাভের জন্য খোদা তা'লা যে নিয়ম নির্ধারণ করেছেন তা তিনি কখনো পরিবর্তন করেন না। সেই নিয়ম বা রীতি হল,** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **এবং** وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ **অর্থাৎ প্রথম কথা হল, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পেতে চাও তাহলে প্রথমে আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চায় তাহলে তার কাছ থেকে কখনো তা গ্রহণ করা হবে না। ইসলামই হল একমাত্র ধর্ম যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। আর ইসলাম কী? মহানবী (সা.)-এর সমস্ত কথা এবং কাজই হল প্রকৃত ইসলাম।'**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই মূলতত্ত্ব অনুধাবন করার সৌভাগ্য দান করুন। এই রমযান আমাদেরকে এ বিষয়ের চেতনা সৃষ্টি করে যেন বিদায় নেয় আর ভবিষ্যতে আগত রমযান পর্যন্ত আমরা যেন এই আদর্শের উপর পরিচালিত হয়ে নতুন গন্তব্যে পৌঁছতে পারি।